বিষয়: কোভিড পরিস্থিতি এবং অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা

"পরীক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প আমরা এখনও ভাবতেই পারিনি"

কথাবার্তায় শিক্ষক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুজিত কুমার পাঁজা, অধ্যাপক দেবাদিত্য ভট্টাচার্য এবং বিশ্বজিৎ কুণ্ডু

ভাবুন, ট্রেনে যেতে যেতে হঠাৎ যে গ্রাম আপনার আমার চোখে ভাসে আবার মিলিয়ে যায় সেখানে চৌমাথার মোড়ে জায়ান্ট স্ক্রিনে ক্লাস শুরু হয়েছে। শিক্ষক বোঝাচ্ছেন চৌবাচ্চায় ফুটো থাকলেও কবে সেটা ভর্তি হবে অথবা তেল মাখা বাঁশে পিছলাতে পিছলাতে একদিন বাঁদর ঠিক কবে উঠে যাবে! ভাবুন, সব পড়ুয়ার হাতে ল্যাপটপ অথবা স্মার্ট ফোন। ভাবুন স্ক্রিনে ভেসে উঠছে, এখন একঘণ্টা মিড-ডে মিলের ছুটি। এটা নাকি আর ফিকশন নেই, ফ্যাক্ট! কাদের জন্য কাদের তৈরি এই ফ্যাক্ট! আমাদের দেশে প্রাথমিক থেকে গবেষণা পর্যন্ত যে শিক্ষাব্যবস্থা তা তো মূলত একটা আদর্শ আর অভ্যাসের কাঠামোতেই স্বচ্ছন্দ। তাতে এই ধাক্কা কীভাবে সামলে নেওয়া যাবে বা কী হবে বিকল্প? উড়ানের টকটার্নে আলোচনায় ছিলেন সাঁতা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মাননীয় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল গার্লস কলেজের অধ্যাপক মাননীয় সুজিত পাঁজা, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় দেবাদিত্য ভট্টাচার্য।

বিশ্বজিৎ : প্রথমেই জিজ্ঞেস করব কেমন আছেন? কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন

দেবাদিত্য : ইউ.এস.এ থেকে আসার পর দিল্লিতে আটকে পড়েছি। অদ্ভুত একটা ব্যাপার, না ঘরে না বাইরে। আমাকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে বলা যায়।

রাজীব : অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। এরকম ভাবে স্কুল বন্ধ থাকাটা অসহনীয়। কখনও ভাবতে পারিনি এরকমও হতে পারে। তবে আমি একা না; সবারই হয়তো এক অবস্থা।

সুজিত : এই অতিমারী এবং লকডাউন তো অবশ্যই মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। খুব একটা ভয় এবং আতঙ্কের একটা আবহ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে আবার আমফান ঝড়। মাকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম কিছুদিন। এই সময়টায় আবার নিয়মিত বই পড়াও শুরু করেছি। মহাশ্বেতা দেবী পড়লাম। কিছু ইংরেজি বই পড়লাম। বিভিন্ন সুচিন্তার মাধ্যমে নিজেকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এছাড়া ফেসবুক পেজে অনলাইন শিক্ষা, পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে লেখালেখিও শুরু করেছি কিছু।

বিশ্বজিৎ : সত্যিই একটা দুঃসময় তো চলছেই। প্রভাব সব দিকেই পড়ছে, প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও। আমরা দেখছি এখন অনলাইন পঠন পাঠনের দিকে পাঠ ব্যবস্থাটা ঝুঁকছে। অথচ, আমাদের দেশ, যেখানে শিক্ষাব্যবস্থা চতুর্মুখী; প্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেশের শিক্ষা পরিকাঠামোতে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা কতটা যথার্থ?

রাজীব : 'সম্ভাব্যতার জন্য প্রস্তুত থাকাটাই সভ্যতা' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। করোনার জন্য পৃথিবী প্রস্তুত ছিলো না। পড়াশোনা লাটে উঠে গেছিল। তবে পরে অনলাইন পড়ার মাধ্যমেই প্রাইভেট টিউশন বা কেরিয়ার গাইডেন্স শুরু হলো। নতুনকে তো স্বাগত জানাতেই হবে। তবে শেখানোর এই মাধ্যমে কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্ন আছে কারণ আমাদের দেশ দারিদ্র পীড়িত। তাছাড়াও একটা প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা সঠিক হবে! আমাদের দেশে বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষা তো নয়। ক্লাসে পড়ানোর সময় কেবল তথ্য প্রদানই হয় না, একটা পারস্পরিক আদান প্রদানও হয়ে থাকে। সৃষ্টি বা আবিষ্কার কোনওটাই সামনা সামনি না থাকলে, ছুঁতে না পারলে, ধরতে না পারলে, সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, এই আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অনলাইন ব্যবস্থা একটা সমান্তরাল ব্যবস্থা হতেই পারে।

দেবাদিত্য : দেখো, ব্যক্তিগতভাবে আমি অনলাইন ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। এখন অনলাইন ব্যবস্থা প্যান্ডেমিকের অজুহাতে খাড়া করা হচ্ছে বটে কিন্তু এই অনলাইনের ঝোঁক পলিসি মেকিংয়ে অনেকদিন আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে। এটা ইউ.জি.সি গাইডলাইনে পর্যন্ত রয়েছে। অনলাইন ব্যবস্থা এর আগে এসেছে ইউ.এস.এতে, নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি গুলোয় ২০০৮-এর বিশ্ব মন্দার পর থেকে। নীতিগতভাবে দেখলে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় এই ঠেলা আবার ওদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরে যাওয়া, এটা একটা দারুণ বৈপরীত্য। যে ডিজিটাল মাধ্যম আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করতে তৎপর, সেটারই ঠিকঠাক ব্যবহার পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে করা হল না। অবশ্য এটাকে কন্ট্রাস্ট না বলে ইউনাইটেড পলিসি ইন্টেনশন বলা যেতে পারে। উন্নয়নই এর ভিত্তি। NSSO ডেটা দেখলেই বোঝা যায় ভারতে কত বাড়িতে ইন্টারনেট আছে, কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন আছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় ডিফান্ডিংএর একমাত্র বেরিয়ে আসার রাস্তা হচ্ছে অনলাইন ব্যবস্থা। শিক্ষাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে পাওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা আগে সরকারের দায়িত্ব ছিল আর এখন তা প্রত্যেকের

নিজস্ব। বিচার করা হচ্ছে কার স্ক্রিন সাইজ কত, র‍্যাম কত, ব্যান্ড উইথ কত।

সুজিত : বিগত শতাব্দীর আটের দশক থেকে শিক্ষার একরকমের গণতন্ত্রীকরণ হচ্ছে যেখানে অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামোই নেই। এখন, অনলাইন ব্যবস্থা হলে বিল্ডিং লাগবে না, অত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ লাগবে না। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০২ সাল অনুযায়ী একটা মৌলিক অধিকার হল শিক্ষা। তার জন্য প্রয়োজন হল সংযুক্তিকরণ মূলক মনোভাব। এদেশে বেশিরভাগ মানুষের হাতে স্মার্টফোন না থাকায় উল্টে একটা ডিজিটাল বিভাজন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এটা একটা স্টপ গ্যাপ ব্যবস্থা ঠিকই, কিন্তু এটা মূল কার্যের পরিপন্থী।

বিশ্বজিৎ : ডিজিটাল বিভাজন। এই যে শব্দবন্ধটা আমরা পেলাম, এটা কিন্তু মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ। বিভাজন যে কোনও ক্ষেত্রেই ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি তো করেই থাকে। এই ডিজিটাল বিভাজন আর কী কী সমস্যা আনতে পারে বলে মনে হচ্ছে? যে সমস্যা গুলো এখন দেখা যাচ্ছে তা কি ডুবন্ত পাহাড়ের চূড়া মাত্র?

দেবাদিত্য : ইউজিসির চেয়ারম্যান বলছেন অনলাইন ব্লেন্ডেড লার্নিং-এর দিকে এগোতে হবে। আকাদেমিক ক্যালেন্ডারে বলা হচ্ছে পঁচিশ শতাংশ পাঠ্য অনলাইনে তুলে আনতে হবে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, অনলাইন এই শিক্ষা মাধ্যম একটা আপৎকালীন ব্যবস্থা হতে পারে কিন্তু কোনও ভাবেই প্রচলিত ব্যবস্থার বিকল্প নয়। কিন্তু ইউজিসির চেয়ারম্যান এই পঁচিশ শতাংশকে বাড়িয়ে চল্লিশ শতাংশ করতে চাইছেন। তাঁদের মতে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা আগামী দিনের একটা বড় পদক্ষেপ। দিল্লি ইউনিভার্সিটি বলছে ফাইনাল সেমেস্টার পরীক্ষা অনলাইনে "ওপেন বুক" হবে। তাতে দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীরা কোর্টে মামলা করে বলেছে আমরা কোথায় আছি? আমরা কীভাবে দেব? তবুও কিন্তু অনলাইন ব্যবস্থাকেই সার্বিক ভাবে প্রয়োগ করার সবরকম প্রচেষ্টা চলছে।

বিশ্বজিৎ : এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা কী রকম দেখছ?

দেবাদিত্য : আমার ভীষণ ফ্রাস্ট্রেশন হচ্ছে। আমরা কোনো নরম্যাটিভ তৈরি করতে পারিনি। এই পুরো ব্যবস্থাটা কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভাবছি মাইনে পাচ্ছি তাই পড়াতেই হবে। পাঠ চর্চায় কেউ বাদ গেল কি না আমরা ভাবছিই না। অথচ বেশিরভাগ শিক্ষক শিক্ষিকা পড়ানোর পর রিপোর্ট দিচ্ছেন যে দিব্যি

হচ্ছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয় দারুণ সুন্দর চলছে। এভাবে হয় না। খুব খারাপ অবস্থা। শিক্ষকদের একটা পলিসি ন্যারেটিভ তৈরি করতেই হবে যত দ্রুত সম্ভব।

রাজীব : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমার নিজেরই একটা প্রশ্ন আছে। এই যে ব্যবস্থা ওঁরা আমাদের ওপর, ছেলেমেয়েদের ওপরে চাপাচ্ছেন, ছেলেমেয়েদের সব চাহিদা মেটানো যাচ্ছে কি এতে? তারা তো হাঁপিয়ে উঠছে। উচ্চশিক্ষার অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। এই ব্যবস্থাটি কোনও অংশেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। বেসরকারি সংস্থা গুলো অনলাইনে পৌঁছে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হচ্ছে...

সুজিত : শিক্ষকের ভূমিকা থাকে জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত করে তোলার সাথে সাথে মনুষ্যত্ব এবং চরিত্র গঠনও। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের সিংহভাগ অসন্তুষ্ট থাকলেও আমাদের উপায় নেই। শিক্ষকদের মতামতের গুরুত্বই নেই কারণ নীতিনির্ধারণ সরকারের উর্ধ্বতন স্তরে হয়ে থাকে। এখন এই অনলাইন বিবর্তন কতটা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে। হিসেবের গড়মিলে শিক্ষক অভিভাবক সকলেই নাজেহাল। আমাদের বিবেকে লাগছে, আমাদের সমর্থন নেই। শিক্ষক পড়াশোনার উপাদান তৈরি করতে পারেন মাত্র, তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের। অথচ কোনও সরকারই শিক্ষক সংগঠনের বা অভিভাবক বা ছাত্রছাত্রীদের মতামত নিয়ে কাজ করে না। একতরফা ভাবে চাপিয়ে দেয়।

বিশ্বজিৎ : শিক্ষার প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা রয়েছে। যেমন বলা যায় প্রাথমিক বা উচ্চপ্রাথমিক স্তরে 'স্কুলছুট' হওয়ার সমস্যা। এই সমস্যা অত্যন্ত পুরোনো। তাতে ধীর গতিতে উন্নতি হলেও করোনা পরিস্থিতিতে এটা আরও ভয়াবহ হতে চলেছে। তার সাথেই যেটা দুশ্চিন্তার সেটা হল 'শিশু শ্রমিক'। ভারত সরকারের মতে বর্তমাণে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু শ্রমিক। আই এল ও'র মতে যা ৫ কোটি। অর্থাৎ প্রতি এগারো জন শিশুর মধ্যে এক জন শিশুশ্রমিক। বর্তমানে মাধ্যমিকের ফলাফল বেরোয়নি, উচ্চমাধ্যমিক থমকে। পড়ুয়াদের মধ্যে মানসিক উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে যে এর পর কী হবে? এই যে সময়টা নষ্ট হল সেটাই বা কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে?

রাজীব : এই এক মারাত্মক বিশৃঙ্খলা চলছে। পড়ুয়ারা আশঙ্কিত। যা কিছু সাহায্য তা টেলিফোনের মাধ্যমে, এভাবে পড়াশোনা হয়! বড় ক্ষতি হয়ে গেল একটা। আমরা ভীষণ অসহায় বোধ করছি। অনভ্যাস একটা বড়ো ব্যাপার। এই ভাবে বাড়িতে বসে থেকে কীই বা হবে?

বিশ্বজিৎ : স্কুল, কলেজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে হাতে কলমের অংশগুলো, গবেষণাগারের অংশগুলো, এছাড়া এগুলোর আঙ্গিক হিসেবে ক্রীড়া উৎসব, এক্সকারশন, এসবের ভবিষ্যৎ কী বলে মনে হচ্ছে?

সুজিত : দেখো, এমনিও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য খুব কঠিন একটা অবস্থা। পড়াশোনাটা এলাকা ভিত্তিক করলে ভালো হয় মানে বৃহৎ পর্দা বা দূরদর্শনের মাধ্যমে। তাতেও পৌঁছনো যাচ্ছে না। আতঙ্কিত অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের করোনা না মিটলে স্কুল কলেজে পাঠাতে চাইবেন না। এক্সকারশনটা সম্ভব না, খেলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বন্ধ হবে।

বিশ্বজিৎ : বহু বিষয় এমন আছে যার একটি গবেষণা তৈরি করতে গেলে ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি ভূগোলের ছাত্র। এখানে ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেরকমই অন্যান্য বিষয় যেমন রুরাল ডেভেলপমেন্ট বা সোশ্যাল ওয়ার্ক এগুলো তো বন্ধের মুখে।

দেবাদিত্য : একটা পুরোপুরি অপ্রস্তুত পরিস্থিতি এটা। তবু, আমি খানিকটা ভিন্ন মত পোষণ করি। পড়াশোনার একেবারে ক্ষতি হয়ে গেছে তাও নয় পুরোপুরি। যা আমরা দেখছি ১০০ বছরে কেউ দেখেনি। এই অভিজ্ঞতাটা কি কম গুরুত্বপুর্ণ ? এটা কি শিক্ষা নয়? শিক্ষা কি তোতা কাহিনির শুধুই পুঁথিগত বিদ্যা? গত তিন মাসে আমরা যা যা প্রত্যেকে করলাম তাও তো শিক্ষা। বরং বলতে চাই, আমাদের শিক্ষার একটা ঠিকঠাক বিকল্প তৈরি করতে হবে। অতিমারী আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে যে পরীক্ষার বিকল্প কী হতে পারে। 'এত সহস্র বছর পর আমরা বুঝতে পারছি যে একটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা পরীক্ষার বাইরে কিছু ভাবতেই পারিনি।' রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা বাস্তবায়িত করতে পেরেছি। এই অতিমারী বরং একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। এখন আমরা অন্য কিছু ভাবতে পারি না? সব কিছুতেই একটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য না রেখে আমরা কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলোকে কাজে লাগাতে পারতাম। শিক্ষা কেবল বুদ্ধিমত্তার শ্রম নয়, শিক্ষা একটা চিন্তার শ্রমও। মজা হচ্ছে, এই আমরাই পরীক্ষা ভিত্তিক

শিক্ষা ব্যবস্থা জারি রেখেছিলাম, অথচ অতিমারীর পরীক্ষায় আমরা সকলেই ভয়ঙ্কর ভাবে ব্যর্থ হয়েছি।

বিশ্বজিৎ : এছাড়াও একজন ছাত্র হিসেবে আমি উপলব্ধি করেছি যে কলেজ জীবনের একটা সামাজিকতা থাকে। সমাজের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করা থেকে সমাজে নিজের ভূমিকা কী হবে, তা উপলব্ধি করার প্রাথমিক ধাপ এই কলেজ জীবনই। এখন ক্যাম্পাসে না আসতে পারার দরুণ ছেলেমেয়েদের সেটার একটা অভাব বোধ হয় থেকে গেল। ছাত্রাবাসে যারা থেকেছে, তাঁরা জানেন, সেটাও একটা নতুন পরিবার। এই সম্পূর্ণ পর্বটা কি সংকটের মুখে?

দেবাদিত্য : আরে, এটাই তো সবচেয়ে বড় ক্ষতি। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন অনেক ছাত্রছাত্রীর কাছে জীবন গড়ার স্থানও ছিল, গণতন্ত্রের প্রশিক্ষণেরও একটা জায়গা ছিল। একে অপরের সাথে আড্ডা দেওয়া, কথা বলা, চেনা এসবের মাধ্যমেই তো একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে তরুণ চিন্তার পরিচয় ঘটে। লকডাউনের আগে একটা স্প্রিং অফ রেজিস্টেন্স ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিএএ'র বিরুদ্ধে বলা ইত্যাদি। লকডাউনে এটা দিব্যি সরিয়ে দেওয়া গেল এবং সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা এভাবেই করে দেওয়া গেল।

বিশ্বজিৎ : সমগ্র বিষয়টায় যারা উপেক্ষিত তারা হলাম আমরা অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষিকারা। আগে অনেকটা সুন্দর সময় বাচ্চাদের সাথে কাটানো হত। আমাদের পদ্ধতিটাই তো "চক অ্যান্ড টক"। সারাটা দিন এই প্রসেসটায় থেকে আমাদেরও যে প্রাপ্তিটা হত সেই সবকিছুর থেকেই আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এ বিষয়ে কী বলবেন?

দেবাদিত্য : একদমই। এটাই আমাদের বেঁচে থাকার রসদ, আর সেটাই চলে গেল। যে কোনও শ্রমজীবী মানুষেরই তা হয়েছে। আমাদের রোজকার নির্দিষ্ট ভালো থাকাটা যেহেতু নেই আর, তাই আমাদের বিকল্প ভালো থাকা তৈরি করতেই হবে। শেখানোটা দূর থেকে অন্যভাবে প্রয়োগ করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, শুধু সংখ্যার নয় কল্পনারও। হতে পারে টেলি কনফারেন্সিং। ওদের বোঝাতে হবে যে সত্যিকারের কিছু হারায়নি। আমরা যা পেয়েছি তা একশো বছরে কেউ পায়নি। নতুন করে ভাবতে

হবে, ভাবাতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের একত্রিত ভাবেই করতে হবে।

বিশ্বজিৎ : আসলে এটা এমন একটা বিষয়, যা নিয়ে আলোচনার কোনও শেষ হয় না। তবু আজকের এই সীমিত সময়ে আপনারা আপনাদের যে মূল্যবান চিন্তা গুলো রাখলেন, তা আমাদের আগামীর পথ ভাবতে সাহায্য করবে। সবাইকে ধন্যবাদ। অতিমারীর শেষে নিশ্চয়ই মুখোমুখি একটা আলোচনায় আবার সবাইকে পাবো।